আল'আলাক

৯৬

নামকরণ

সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত আলাক (عَلَقٍ) শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরাটির দু'টি অংশ। প্রথম অংশটি اِقْرَاْ থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম আয়াতে مَالَمْ يَعْلَمْ এ গিয়ে শেষ হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশটি كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশটি যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ সর্বপ্রথম অহী এ ব্যাপারে উম্মাতে মুসলিমার আলেম সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমত। এ প্রসংগে ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ অসংখ্য সনদের মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তা সর্বাধিক সহীহ হাদীস হিসেবে গণ্য। এ হাদীসে হযরত আয়েশা নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ওহী শুরু হবার সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও ইবনে আব্বাস (রা), আবু মূসা আশ'আরী (রা) ও সাহাবীগণের একটি দলও একথা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম কুরআনের এই আয়াতগুলোই নাযিল হয়েছিল। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হারম শরীফে নামায পড়া শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁকে হুমকি দিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তখন দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়।

অহীর সূচনা

মুহাদ্দিসগণ অহীর সূচনাপর্বের ঘটনা নিজের নিজের সনদের মাধ্যমে ইমাম যুহ্রী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহ্রী এ ঘটনা হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে এবং তিনি নিজের খালা হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহীর সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের (কোন কোন বর্ণনা অনুসারে ভালো স্বপ্নের) মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, মনে হতো যেন দিনের আলোয় তিনি তা দেখছেন। এরপর তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়েন। এরপর কয়েকদিন হেরা গুহায় অবস্থান করে দিনরাত ইবাদাতের মধ্যে কাটিয়ে দিতে থাকেন। (হযরত আয়েশা (রা) তাহান্নুস (تحنث) শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইমাম যুহ্রী তা'আব্বুদ (تعبد) বা ইবাদাত–বন্দেগী শব্দের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তিনি কোন্

ধরনের ইবাদাত করতেন? কারণ তখনো পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবাদাতের পদ্ধতি তাঁকে শেখানো হয়নি) ঘর থেকে খাবার-দাবার নিয়ে তিনি কয়েকদিন সেখানে কাটাতেন। তারপর হযরত খাদীজার (রা) কাছে ফিরে আসতেন। তিনি আবার কয়েক দিনের খাবারসামগ্রী তাঁকে যোগাড় করে দিতেন। একদিন তিনি হেরা গুহার মধ্যে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর ওপর ওহী নাযিল হলো। ফেরেশ্‌তা এসে তাঁকে বললেন : "পড়ো" এরপর হযরত আয়েশা (রা) নিজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন : আমি বললাম, "আমি তো পড়তে জানি না।" একথায় ফেরেশতা আমাকে ধরে বুকের সাথে ভয়ানক জোরে চেপে ধরলেন। এমনকি আমি তা সহ্য করার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেল্লাম। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ো!" আমি বললাম, "আমি তো, পড়তে জানি না।" তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে বুকের সাথে ধরে ভয়ানক চাপ দিলেন। আমার সহ্য করার শক্তি প্রায় শেষ হতে লাগলো। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ো!" আমি আবার বললাম, "আমি তো পড়া জানি না।" তিনি তৃতীয়বার আমাকে বুকের সাথে ভয়ানক জোরে চেপে ধরলেন আমার সহ্য করার শক্তি খতম হবার উপক্রম হলো। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (পড়ো নিজের রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন) এখান থেকে مَالَمْ يَعْلَمْ (যা সে জানতো না) পর্যন্ত। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে ফিরলেন। তিনি হযরত খাদীজার (রা) কাছে ফিরে এসে বললেন : "আমার গায়ে কিছু (চাদর-কম্বল) জড়িয়ে দাও। আমার গায়ে কিছু (চাদর-কম্বল) জড়িয়ে দাও!" তখন তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেয়া হলো। তাঁর মধ্য থেকে ভীতির ভাব দূর হয়ে গেলে তিনি বললেন : "হে খাদীজা! আমার কি হয়ে গেলো? তারপর তিনি তাঁকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার নিজের জানের ভয় হচ্ছে।" হযরত খাদীজা বললেন : "মোটেই না। বরং খুশী হয়ে যান। আল্লাহর কসম! আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। সত্য কথা বলেন। (একটি বর্ণনায় বাড়তি বলা হয়েছে, আপনি আমানত পরিশোধ করে দেন,) অসহায় লোকদের বোঝা বহন করেন। নিজে অর্থ উপার্জন করে অভাবীদেরকে দেন। মেহমানদারী করেন। ভালো কাজে সাহায্য করেন।" তারপর তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গেলেন। ওয়ারাকা ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই। জাহেলী যুগে তিনি ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আরবী ও ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন। অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, ভাইজান! আপনার ভাতিজার ঘটনাটা একটু শুনুন। ওয়ারাকা রসূলুল্লাহকে (সা) বললেন : "ভাতিজা! তুমি কি দেখেছো?" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখেছিলেন তা বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকা বললেন : "ইনি সেই নামূস (অহী বহনকারী ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ মূসার (আ) ওপর নাযিল করেছিলেন। হায়, যদি আমি আপনার নবুওয়াতের জামানায় শক্তিশালী যুবক হতাম! হায়, যদি আমি তখন জীবিত থাকি যখন আপনার কওম আপনাকে বের করে দেবে।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : "এরা কি আমাকে বের করে দেবে?" ওয়ারাকা বললেন : "হাঁ, কখনো এমনটি হয়নি, আপনি যা নিয়ে এসেছেন কোন ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে এবং তার সাথে শত্রুতা করা হয়নি। যদি আমি আপনার

সেই আমলে বেঁচে থাকি তাহলে আপনাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করবো।" কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ওয়ারাকা ইন্তিকাল করেন।

এ ঘটনা নিজেই একথা প্রকাশ করছে যে, ফেরেশতার আসার এক মুহূর্ত আগেও রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নবী বানিয়ে পাঠানো হবে এ সম্পর্কে তিনি বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। তাঁর এই জিনিসের প্রত্যাশী বা আকাংক্ষী হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর সাথে যে এই ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে, একথা তিনি আদৌ কখনো কল্পনা করতে পারেননি। অহী নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার এভাবে সামনে এসে যাওয়া তাঁর জন্যে ছিল একটি আকস্মিক ঘটনা। এর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া তাঁর ওপর ঠিক তাই হয়েছে যা একজন বেখবর ব্যক্তির সাথে এত বড় একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। এ কারণেই যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে আসেন তখন মক্কার লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে সব রকমের আপত্তি উঠায় কিন্তু তাদের একজনও একথা বলেনি, আমরা তো আগেই আশংকা করেছিলাম আপনি কোন একটা কিছু হওয়ার দাবী করবেন, কারণ আপনি বেশ কিছুকাল থেকে নবী হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

এ ঘটনা থেকে নবুওয়াতের আগে তাঁর জীবন কেমন পবিত্র ছিল এবং তাঁর চরিত্র ও কর্মকাণ্ড কত উন্নত পর্যায়ের ছিল সে কথাও জানা যায়। হযরত খাদীজা (রা) কোন অল্প বয়স্কা মহিলা ছিলেন না। বরং এই ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল পঞ্চান্ন বছর। পনের বছর ধরে তিনি রসূলের জীবন সঙ্গিনী ছিলেন। স্ত্রীর কাছে স্বামীর কোন দুর্বলতা গোপন থাকতে পারে না। এই দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে এমনিই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হিসেবে পেয়েছিলেন যে, যখনই তিনি তাঁকে হেরা গুহার ঘটনা শুনান তখনই নির্দ্বিধায় তিনি স্বীকার করে নেন যে, যথার্থই আল্লাহর ফেরেশতা তাঁর কাছে অহী নিয়ে এসেছিলেন। অনুরূপভাবে ওয়ারাকা ইবনে নওফলও মক্কার একজন বয়োবৃদ্ধ বাসিন্দা ছিলেন। তিনি শৈশব থেকেই মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা) জীবন দেখে আসছিলেন, তাছাড়া পনের বছরের নিকট আত্মীয়তার কারণে তাঁর অবস্থা তিনি আরো গভীরভাবে অবগত ছিলেন। তিনিও এ ঘটনা শুনে একে কোন প্ররোচনা মনে করেননি। বরং শুনার সাথে সাথেই বলে দেন, ইনি সেই একই "নামূস" যিনি মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসেছিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, তাঁর মতেও মুহাম্মাদ (সা) এমনই উন্নত ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না।

দ্বিতীয় অংশ নাযিলের প্রেক্ষাপট

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কা'বা শরীফে ইসলামী পদ্ধতিতে নামায পড়তে শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁকে হুমকি দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, ঠিক সে সময় এই সূরার দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়। দেখা যায়, নবী হবার পর প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেবার কাজ শুরু করার আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর শেখানো পদ্ধতিতে হারম শরীফে নামায পড়তে শুরু করেন এবং এ কাজটির কারণে কুরাইশরা প্রথমবার অনুভব করে যে, তিনি কোন নতুন দীনের অনুসারী হয়েছেন। অন্য লোকেরা অবাক চোখে এ দৃশ্য দেখছিল। কিন্তু আবু

জেহেলের জাহেলী শিরা-উপশিরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং সে এভাবে হারম শরীফে ইবাদাত করা যাবে না বলে তাঁকে ধমকাতে থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে কয়েকটি হাদীসে আবু জেহেলের এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন দুষ্কৃতি উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আবু জেহেল কুরাইশদেরকে জিজ্ঞেস করে, "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি তোমাদের সামনে যমীনের ওপর মুখ রাখছে? লোকেরা জবাব দেয়, "হাঁ"। একথায় সে বলে, "লাত ও উয্যার কসম, যদি আমি তাকে এভাবে নামায পড়তে দেখি তাহলে তার ঘাড়ে পা রেখে দেবো এবং মাটিতে তার মুখ রগড়ে দেবো।" তারপর একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়তে দেখে সে তাঁর ঘাড়ের ওপর পা রাখার জন্যে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ লোকেরা দেখে সে পিছনের দিকে সরে আসছে এবং কোন জিনিস থেকে নিজের মুখ বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার কি হয়েছে? সে বলে, আমার ও তার মাঝখানে আগুনের একটি পরিখা, একটি ভয়াবহ জিনিস ও কিছু ডানা ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে যদি আমার ধারেকাছে ঘেঁসতো তাহলে ফেরেশতারা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। (আহমাদ, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, আবু নাঈম ইসফাহানী ও বায়হাকী)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ আবু জেহেল বলে, যদি আমি মুহম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বার কাছে নামায পড়তে দেখি তাহলে পায়ের নীচে তার ঘাড় চেপে ধরবো। একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছে যায়। তিনি বলেন, যদি সে এমনটি করে তাহলে ফেরেশতারা প্রকাশ্যে তাকে এসে ধরবে। (বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, আবদুর রাজ্জাক, আব্দ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া)

ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত আর একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ছিলেন, আবু জেহেল সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। সে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে এ থেকে নিষেধ করিনি? একথা বলে সে তাঁকে ধমকাতে শুরু করলো। জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কঠোরভাবে ধমক দিলেন। তাঁর ধমকানি শুনে সে বললো, হে মুহাম্মাদ! কিসের জোরে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? আল্লাহর কসম! এই উপত্যকায় আমার সমর্থকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, ইবনুল মুনযির, তাবারানী ও ইবনে মারদুইয়া)

এই ঘটনাবলীর কারণে كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى থেকে সূরার যে অংশটি শুরু হচ্ছে সেটি নাযিল হয়। কুরআনের এই সূরাটিতে এই অংশটিকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে স্বাভাবিকভাবে এর মর্যাদা তাই হওয়া উচিত। কারণ প্রথম অহী নাযিল হবার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রথম প্রকাশ করেন নামাযের মাধ্যমে এবং এই ঘটনার ভিত্তিতেই কাফেরদের সাথে তাঁর প্রথম সংঘাত হয়।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

পড়ো[১] (হে নবী), তোমার রবের নামে।[২] যিনি সৃষ্টি করেছেন।[৩] জমাট বাঁধা রক্তের দলা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।[৪] পড়ো, এবং তোমার রব বড় মেহেরবান, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন।[৫] মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানতো না।[৬]

১. ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলে এসেছি, ফেরেশতা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, পড়ো। তিনি জবাব দিলেন, আমি পড়া জানি না। এ থেকে জানা যায়, ফেরেশতা অহীর এই শব্দগুলো লিখিত আকারে তাঁর সামনে পেশ করেছিলেন এবং তাঁকে সেগুলো পড়তে বলেছিলেন। কারণ ফেরেশতার কথার অর্থ যদি এই হতো, আমি বলতে থাকি এবং আপনি পড়তে থাকুন তাহলে আমি পড়া জানি না একথা বলার তাঁর প্রয়োজন হতো না।

২. অর্থাৎ তোমার রবের নাম নিয়ে পড়ো। অন্য কথায়, বিসমিল্লাহ বলো এবং পড়ো। এ থকে একথাও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অহী আসার আগে একমাত্র আল্লাহকেই নিজের রব হিসেবে জানতেন ও মানতেন। এ জন্যই তাঁর রবকে, একথা বলার প্রয়োজন হয়নি বরং বলতে হয়েছে, তোমার রবের নাম নিয়ে পড়ো।

৩. শুধু বলা হয়েছে, "সৃষ্টি করেছেন।" কাকে সৃষ্টি করেছেন তা বলা হয়নি। এ থেকে আপনা আপনিই এ অর্থ বের হয়ে আসে, সেই রবের নাম নিয়ে পড়ো যিনি স্রষ্টা, যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহান এবং বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন।

৪. সাধারণভাবে বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টির কথা বলার পর বিশেষ করে মানুষের কথা বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কেমন হীন অবস্থা থেকে তার সৃষ্টিপর্ব শুরু করে তাকে পূর্ণাংগ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। আলাক (عَلَق) হচ্ছে আলাকাহ (عَلَقَه) শব্দের বহুবচন। এর মানে জমাট বাঁধা রক্ত। গর্ভ সঞ্চারের পর প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় এটি হচ্ছে সেই প্রাথমিক অবস্থা। তারপর তা গোশ্‌তের আকৃতি ধারণ

كَلَّآ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰٓ ﴿٦﴾ أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنَىٰٓ ﴿٧﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰٓ ﴿٨﴾ أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿٩﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ﴿١٠﴾

কখনই নয়,[৭] মানুষ সীমালংঘন করে। কারণ সে নিজেকে দেখে অভাবমুক্ত।[৮] (অথচ) নিশ্চিতভাবেই তোমার রবের দিকেই ফিরে আসতে হবে।[৯] তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে যে এক বান্দাকে নিষেধ করে যখন সে নামায পড়ে?[১০]

করে। এরপর পর্যায়ক্রমে মানুষের আকৃতি লাভের কার্যক্রম শুরু হয়। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হজ্জ ৫ আয়াত, ৫ থেকে ৭ টীকা)

৫. অর্থাৎ তাঁর অশেষ মেহেরবানী। এই হীনতম অবস্থা থেকে শুরু করে তিনি মানুষকে জ্ঞানের অধিকারী করেছেন এটি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় গুণ হিসেবে স্বীকৃত। আর তিনি মানুষকে কেবল জ্ঞানের অধিকারীই করেননি, কলম ব্যবহার করে তাকে লেখার কৌশল শিখিয়েছেন। এর ফলে কলম জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার, উন্নতি এবং বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। যদি তিনি ইলহামী চেতনার সাহায্যে মানুষকে কলম ব্যবহার করার ও লেখার কৌশল না শেখাতেন তাহলে মানুষের জ্ঞানগত যোগ্যতা স্তব্ধ ও পংগু হয়ে যেতো। তার বিকশিত ও সম্প্রসারিত হবার এবং বংশানুক্রমিক অগ্রগতি তথা এক বংশের জ্ঞান আর এক বংশে পৌঁছে যাবার এবং সামনের দিকে আরো উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করার সুযোগই তিরোহিত হতো।

৬. অর্থাৎ মানুষ আসলে ছিল সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। আল্লাহর কাছ থেকেই সে যা কিছু জ্ঞান লাভ করেছে। আল্লাহ যে পর্যায়ে মানুষের জন্য জ্ঞানের দরজা যতটুকু খুলতে চেয়েছেন ততটুকুই তার জন্য খুলে গিয়েছে। আয়াতুল কুরসীতে একথাটিই এভাবে বলা হয়েছে ঃ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ "আর লোকেরা তাঁর জ্ঞান থেকে তিনি যতটুকু চান তার বেশী কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না।" (আল বাকারাহ ২৫৫) যেসব জিনিসকে মানুষ নিজের তাত্বিক আবিষ্কার বলে মনে করে সেগুলো আসলে প্রথমে তার জ্ঞানের আওতায় ছিল না। আল্লাহ যখন চেয়েছেন তখনই তার জ্ঞান তাকে দিয়েছেন। মানুষ কোনক্রমেই অনুভব করতে পারেনি যে, আল্লাহ তাকে এ জ্ঞান দান করছেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল সেগুলোর আলোচনা এখান পর্যন্ত শেষ। যেমন হযরত আয়েশার (রা) হাদীস থেকে জানা যায় ঃ এই প্রথম অভিজ্ঞতাটি খুব বেশী কঠিন ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাইতে বেশী বরদাশ্‌ত করতে পারতেন না। তাই তখন কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, তিনি যে রবকে প্রথম থেকে জানেন ও মানেন তিনি সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করছেন। তাঁর পক্ষ থেকে অহীর সিলসিলা শুরু হয়ে গেছে এবং তাঁকে তিনি নিজের নবী বানিয়ে নিয়েছেন। এর বেশ কিছুকাল পরে সূরা আল মুদ্‌দাসসিরের প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হয়। সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে নবুওয়াত

লাভ করার পর এখন কি কি কাজ করতে হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন আল মুদ্‌দাসসিরের ভূমিকা)।

৭. অর্থাৎ যে মেহেরবান আল্লাহ এত বড় মেহেরবানী করেছেন তাঁর মোকাবেলায় মূর্খতার বশবর্তী হয়ে কখনো এমন কর্মনীতি অবলম্বন করা উচিত নয় যা সামনের দিকে বর্ণনা করা হচ্ছে।

৮. অর্থাৎ দুনিয়ায় ধন-দৌলত, সম্মান-প্রতিপত্তি যা কিছু সে চাইতো তার সবই সে লাভ করেছে এ দৃশ্য দেখে সে কৃতজ্ঞ হবার পরিবর্তে বরং বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে এবং সীমালংঘন করতে শুরু করেছে।

৯. অর্থাৎ দুনিয়ায় সে যাই কিছু অর্জন করে থাকুক না কেন এবং তার ভিত্তিতে অহংকার ও বিদ্রোহ করে ফিরুক না কেন, অবশেষে তাকে তোমার রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন এই মনোভাব ও কর্মনীতির পরিণাম সে জানতে পারবে।

১০. বান্দা বলতে এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। এ পদ্ধতিতে কুরআনের কয়েক জায়গায় তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا –

"পবিত্র সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে নিয়ে গিয়েছেন এক রাতে মসজিদে হারম থেকে মসজিদে আকসার দিকে।" (বনি ইসরাঈল ১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ

"সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন কিতাব।" (আল কাহফ ১)

وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا –

"আর আল্লাহর বান্দা যখন তাকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন লোকেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলো।" (আল জিন ১৯)

এ থেকে জানা যায়, এটা ভালোবাসার একটা বিশেষ ধরনের প্রকাশভংগী। এ পদ্ধতিতে আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও এ থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ নবুওয়াতের দায়িত্বে নিযুক্ত করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআনের কোথাও এই পদ্ধতির কথা বলা হয়নি। কোথাও বলা হয়নি, হে নবী! তুমি এভাবে নামায পড়ো। কাজেই কুরআনে যে অহী লিখিত হয়েছে কেবলমাত্র এই অহীটুকুই যে রসূলের (সা) ওপর নাযিল হতো না— এটি তার আর একটি প্রমাণ। বরং এরপরও অহীর মাধ্যমে আরো এমন সব বিষয়ের তালিম দেয়া হতো যা কুরআনে লিখিত হয়নি।

أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰٓ ﴿١١﴾ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقْوَىٰٓ ﴿١٢﴾ أَرَءَيْتَ إِن
كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ ﴿١٣﴾ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ
لَنَسْفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَٰذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ
ٱلزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ۩ ﴿١٩﴾

তুমি কি মনে করো, যদি (সেই বান্দা) সঠিক পথে থাকে অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়? তুমি কি মনে করো, যদি (এই নিষেধকারী সত্যের প্রতি) মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়? সে কি জানে না, আল্লাহ দেখছেন?[১১] কখনই নয়,[১২] যদি সে বিরত না হয় তাহলে আমি তার কপালের দিকের চুল ধরে তাকে টানবো, সেই কপালের চুল (ওয়ালা) যে মিথ্যুক ও কঠিন অপরাধকারী।[১৩] সে তার সমর্থক দলকে ডেকে নিক[১৪] আমিও ডেকে নিই আযাবের ফেরেশতাদেরকে।[১৫] কখনই নয়, তার কথা মেনে নিয়ো না, তুমি সিজ্‌দা করো এবং (তোমার রবের) নৈকট্য অর্জন করো।[১৬]

১১. বাহ্যত মনে হয়, এখানে প্রত্যেকটি ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তুমি কি সেই ব্যক্তির কার্যকলাপ দেখেছো যে আল্লাহর এক বান্দাকে ইবাদাত করা থেকে বিরত রাখছে? যদি সেই বান্দা সঠিক পথে থাকে অথবা মানুষকে আল্লাহর ভয় দেখায় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, আর এই ইবাদাতে বাধাপ্রদানকারী সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তার এই তৎপরতা সম্পর্কে তুমি কি মনে করো? যে ব্যক্তি এই কর্মনীতি অবলম্বন করেছে সে যদি জানতো, যে বান্দা নেকীর কাজ করে আল্লাহ তাকেও দেখেন আবার যে সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে সচেষ্ট তাকেও দেখেন তাহলে সে কি এই কর্মনীতি অবলম্বন করতে পারতো? আল্লাহ জালেমের জুলুম দেখছেন এবং মজলুমের মজলুমীও দেখছেন। তাঁর এই দেখা এ বিষয়টিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে যে, তিনি জালেমের শাস্তি দেবেন এবং মজলুমের ফরিয়াদ শুনবেন।

১২. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি নামায পড়েন তাহলে এই ব্যক্তি নিজের পায়ের চাপে তার ঘাড় পিষে ফেলবে বলে যে হুমকি দিচ্ছে তা কখনো সম্ভবপর হবে না। সে কখনো এমনটি করতে পারবে না।

১৩. কপালের দিক বলে এখানে যার কপাল তাকে বুঝানো হয়েছে।

১৪. যেমন ভূমিকায় আমরা বলেছি, আবু জেহেলের হুমকির জবাবে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ধমক দিয়েছিলেন তখন সে বলেছিল, হে

মুহাম্মাদ! তুমি কিসের জোরে আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? আল্লাহর কসম, এই উপত্যকায় আমার সমর্থকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তার এই কথায় এখানে বলা হচ্ছে ঃ নাও, এখন তাহলে তোমার সেই সমর্থকদের ডেকে নাও।

১৫. মূলে 'যাবানীয়াহ' (زبانية) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাতাদাহর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটি আরবী ভাষায় পুলিশের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর 'যাবান' (زبن) শব্দের আসল মানে হচ্ছে, ধাক্কা দেয়া। রাজা বাদশাহদের দরবারে লাঠিধারী চোবদার থাকতো। তাদের কাজ হতো যার প্রতি বাদশাহ নারাজ হতেন তাকে ধাক্কা দিয়ে দরবার থেকে বের করে দেয়া। কাজেই এখানে আল্লাহর বাণীর অর্থ হচ্ছে, সে তার সমর্থকদেরকে ডেকে আনুক, আর আমি আমার পুলিশ বাহিনী তথা আযাবের ফেরেশাতাদেরকে ডেকে আনি। এই আযাবের ফেরেশতারা তার সমর্থকদেরকে ঠাণ্ডা করে দিক।

১৬. সিজদা করা মানে নামায পড়া। অর্থাৎ হে নবী! তুমি নির্ভয়ে আগের মতো নামায পড়তে থাকো। এর মাধ্যমে নিজের রবের নৈকট্য লাভ করো। সহীহ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ "বান্দা সিজদায় থাকা অবস্থায় তার রবের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়।" আবার মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরার (রা) এ রেওয়ায়াতটিও উদ্ধৃত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটি পড়তেন তখন তেলাওয়াতে সিজ্‌দা করতেন।